ফিকহী ইখতিলাফ

ফিকহী ইখতিলাফ

সালাফের পন্থা ও আমাদের করণীয়

মাওলানা ফয়সাল আহমাদ নদবী

যহীরুল ইসলাম
অনূদিত

নাশাত

ফিকহী ইখতিলাফ
মূল : মাওলানা ফয়সাল আহমাদ নদবী
অনুবাদ : যহীরুল ইসলাম
সম্পাদনা : মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মদ

মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

অর্পণ

মাদীনাতুল উলুম মাদরাসা নাটেশ্বর, নোয়াখালী
যার ছায়ায় কাটিয়েছি জীবনের নয়টি বছর।

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার। পাঁচ বছর পর বইটি প্রকাশিত হচ্ছে।

এ বইয়ের অনুবাদ শেষ হয়েছিল নদওয়াতুল উলামার নূরানী পরিবেশে। এ মুহূর্তে ভেসে উঠছে কত স্মৃতি। এসব স্মৃতিচারণে যেমন রয়েছে সুখ-আনন্দ, আছে তেমনই বিষাদ আর দুঃখ।

পাঠক! বইটির শিরোনাম ও সূচি দেখেই এর গুরুত্ব এবং বিশেষভাবে আমাদের পরিবেশ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে বইটির প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুধাবন করতে পারছি। সালাফের যুগে যে ইখতিলাফ ছিল সম্মান গৌরব আর শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞতার পরিচয়, আজ কিছু অজ্ঞ অবিবেচক মানুষ সেটাকে বিকৃত করে উম্মাহর মাঝে অবিরাম বিশৃঙ্খলা বিভেদ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সবকিছু দিবালোকের মতো পরিষ্কার হবার পরও নিজেদের বক্রতা নিয়ে তারা পড়ে আছে। তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া ছাড়া আমরা আর কী-ইবা করতে পারি! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উম্মাহর কল্যাণে এবং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাবার তাওফিক দান করুন।

প্রিয় পাঠক! প্রতিটি নির্মাণের পেছনে থাকে অনেক মানুষের শ্রম। মিশে থাকে অজস্র মানুষের ঘাম। আমাদের এ কাজটিও এর ব্যতিক্রম নয়। মহান আল্লাহ তার শান অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দান করুন।

যহীরুল ইসলাম
জামিয়া রব্বানিয়া নুরুল উলুম
মিরপুর ঢাকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :

আল্লাহ তায়ালা দীন অনেক সহজ করেছেন। কুরআন মাজীদে এ কথা বারবার বলা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'দীন সহজ' কথাটি বিশ্লেষণ করা যায়। তবে দীনের সহজতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল, ফুরুঈ মাসায়েলের ইখতিলাফ বা শাখাগত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতভেদ। এসকল ইখতিলাফ আছে বলেই মানুষ সহজভাবে শরয়ী বিধি-বিধান মেনে চলতে পারছে। কখনো সংকীর্ণতার শিকার হতে হচ্ছে না; বরং দীনের উপর চলার বিভিন্ন পথ তাদের সামনে উন্মুক্ত থাকছে।

ইখতিলাফ সৃষ্টি হল কীভাবে? এসকল ইখতিলাফ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে নানাবিধ স্বভাবজাত ও যৌক্তিক কার্যকারণ। বরং বলা যায় ইখতিলাফ তথা মতভিন্নতা না হওয়াটাই বরং অযৌক্তিক ও অসম্ভব ছিলো, তাই ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম থেকেই এর সূচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে; কিন্তু এর মাধ্যমে তাদের মাঝে তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। মানুষের অন্তর বিগড়ে যায়নি।

কেননা তারা ইখতিলাফের হাকিকত বুঝতেন। তাই এটাকে তারা প্রশস্ততা আখ্যায়িত করে একে অপরের সাথে জুড়ে থাকতেন। একে অপরের ইহতিরাম করতেন, ইলম ও বড়ত্বের স্বীকৃতি দিতেন।

কিন্তু হঠাৎ করে কী কারণে যেন বিগত একশ বছর ধরে ভারত উপমহাদেশে ইখতিলাফকে ভিন্ন এক রূপ দেওয়া হয়েছে। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই উম্মত বিভক্ত হয়ে পড়েছে দুই শিবিরে। একে অপরের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে, জারি করছে ভ্রষ্টতা আর কুফুরির ফতোয়া। এখন তো এটা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে, রূপ নিয়েছে এক ভয়ংকর ফেতনার। ফলে বিজ্ঞ আলিমগণ পেরেশান হয়ে পড়েছেন, বয়ান-বক্তৃতার পাশাপাশি লেখালেখির মাধ্যমে এই ইনতিশার (বিশৃংখলা) দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু—

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

প্রতিষেধক যতই আসছে, পাল্লা দিয়ে ততই বাড়ছে রোগব্যাধি।

তাই আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে ইখতিলাফের হাকিকত স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সালাফের মাঝেও ইখতিলাফ ছিল, আমাদের মাঝেও আছে। কিন্তু তারা ইখতিলাফকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন আর আমরা দেখছি কেমন করে। পরস্পর কীভাবে তারা সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। আর আমরা পরস্পর কেমন আছি? সালাফের পথ থেকে নিজের অজান্তেই ছিটকে পড়ছি না তো! পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক! এই বিষয় নিয়ে আমাদের ধীরেসুস্থে ভাবতে হবে এবং সালাফের আয়নায় পর্যবেক্ষণ করতে হবে নিজেদের ।

সমকালীন মুহাদ্দিস শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামা সাহেব এই বিষয়ে ইতিদালের সাথে খুবই প্রামাণ্য অতুলনীয় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম—

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء

অন্তত পক্ষে উলামায়ে কেরামের মুতালাআয় গ্রন্থটি থাকা উচিত। এখানে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রয়োজন মনে করছি, কারণ তার গ্রন্থটির মাধ্যমেই আমরা সংশ্লিষ্ট আরো অনেক গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি।

এই রিসালার সকল শিরোনামের অধীনে আলোচিত বিষয়গুলোর একেকটি মতন বা মূলপাঠের মতো, এর ব্যাখ্যায় লেখা যেতে পারে আরো অনেক কথা। কিন্তু পাঠকের হাতে সহজেই পৌঁছানোর লক্ষ্যে সংক্ষেপ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বইটিকে উপকারী হিসেবে এবং মুসলমানদের ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

وما علينا إلا البلاغ المبين

ফয়সাল আহমাদ নদবী
দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ
১৮-১-১৪৩৬ হি.
১২-১১-২০১৪ ঈ.

দীন রক্ষার প্রতিশ্রুতি : ১১
ইখতিলাফ কেন হয়? : ১১
সালাফের দৃষ্টিতে ইখতিলাফের গুরুত্ব : ১৩
ইখতিলাফের ক্ষেত্রে সাহাবিদের কর্মপন্থা : ১৪
তাবেয়ীদের পদ্ধতি : ১৬
ইখতিলাফ : আল্লাহর কাছে রাসুলের মর্যাদার প্রমাণ : ১৬
ইখতিলাফ রহমত ও প্রশস্ততার কারণ : ১৬
হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর অন্তর্দৃষ্টি : ১৭
উম্মতের উপর ইমাম মালিক রহ. এর মহান অবদান : ১৭
সালাফের দৃষ্টিতে যঈফ হাদীসের অবস্থান : ১৮
ইলমে হাদীসের সুক্ষ্মতা ও পদে পদে পদস্খলনের আশঙ্কা : ২০
উসতাদ ছাড়া অর্জিত শুধু কিতাবের জ্ঞান যথেষ্ট নয় : ২১
সালাফের দৃষ্টিতে কিতাবি ইলমের অবস্থান : ২১
তারজীহের সময় বুখারী ও সহীহাইনে সংকলিত হাদীসের মান : ২২
ফতোয়ার জন্য আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান আবশ্যক : ২২
মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে ফকীহদের সম্মান ও মর্যাদা : ২৩
গভীর ইলম থাকা সত্ত্বেও ইজতিহাদের দাবি থেকে বিরত থাকা : ২৫
ফিকহের ইমামদের কাছে হাদীস না পৌঁছার অপবাদ বনাম বাস্তবতা : ২৫
হাদীসশাস্ত্রে ফিকহের ইমামদের অবস্থান : ২৫
মুহাদ্দিসদের বক্তব্যের আলোকে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার মাকাম : ২৬
বর্তমানে বিদ্যমান হাদীসের পরিমাণ এবং ইমামদের মুখস্থ হাদীসের সাথে এর তুলনা : ২৯
ফিকহী মাসায়েলের উৎস : কুরআন, হাদীস কিংবা সঠিক কিয়াস : ৩১
মুজতাহিদ ইমামদের উদ্ঘাটিত মাসায়েল শরিয়তে ইলাহীর মতো : ইবনে হাযম জাহেরী রহ. : ৩১
ফিকহের ইমামদের হাদীসের উপর আমল করার শিক্ষণীয় ঘটনা : ৩১
ফকীহদের কর্মপন্থা ও তাদের উপর মুহাদ্দিসদের আস্থা : ৩৩
আমল বিল হাদীসের নামে সাহাবাদের আমল থেকে বিচ্যুতি : ৩৪
সালাফের মাঝে 'আমলে সাহাবা'র গুরুত্ব : ৩৪
হাদীস সহীহ হওয়াই যথেষ্ট নয়, সালাফের আমল থাকা প্রয়োজন : ৩৫
চার মাযহাবের বিপরীত অবস্থান : ইবনে রজব হাম্বলীর তানকীদ : ৩৭
তাকলীদের নিন্দার্চায় কুরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা : ৩৭
দলীল জিজ্ঞেস করা জনসাধারণের কাজ নয় : ৪০
ইখতিলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সালাফের দুটো অমূল্য নসিহত : ৪০
আগের যুগের জাহেরী ও আজকের জাহেরী সম্প্রদায় : ৪১
হাদীসের নামে হাদীস বিরোধিতা ইবনে রজব এর বর্ণনা : ৪১
একটি হাদীসের আয়নায় বর্তমান পরিস্থিতি : ৪২

দীন রক্ষার প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩﴾

নিশ্চয় এই কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করব।[১]

সাথে সাথে এও বলেছেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

আপনার কাছে উপদেশ-সম্বলিত কুরআন পাঠিয়েছি, যেন মানুষের জন্য অবতীর্ণ বিষয় আপনি সুস্পষ্ট বর্ণনা করতে পারেন।[২]

এ থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল, কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা উম্মাহ পাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে; এবং এটাও বুঝা গেল যে, আল্লাহ হেফাজত করবেন মানে কেবল অক্ষর বা বাক্যের হেফাজত নয়, বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও হেফাজত হবে। ভিন্নভাবে বলা যায়—হাদীস যেহেতু কুরআন মাজিদেরই ব্যাখ্যা, তাই কুরআনের পাশাপাশি হাদীস এবং হাদীসের ব্যাখ্যাও সু-সংরক্ষিত থাকবে।

যুগে যুগে হাফেজ কারী মুহাদ্দিস ও ফকিহদের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা কুরআন হেফাজতের এই প্রতিশ্রুতিরই একটি অংশ। তারা সকলেই তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। ফলে দীন এখনও তার নিজস্ব রূপে সংরক্ষিত আছে।

একদিকে আলেমদের এক জামাত হাদীসের আলফায (শব্দমালা) সংরক্ষণের প্রয়াস চালিয়েছেন। সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ—সবধরনের মিশ্রণ থেকে হাদীসকে মুক্ত রাখার। এভাবে রেওয়ায়েত তথা হাদীসের বাণী উম্মাহর কাছে পৌছানোর দায়িত্ব তারা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। আরেক জামাত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে ইস্তিম্বাত-ইসতিখরাজের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন। প্রস্তুত করেছেন এর নিয়মকানুন, যেন দীন-ধর্ম খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত না হয়। এভাবে তারা কুরআন হাদীস থেকে লক্ষ লক্ষ মাসায়েল বের করে দিরায়াত তথা হাদীসের মর্মার্থ সুরক্ষিত রাখার যিম্মাদারিও আদায় করে দীনকে উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন খুবই সহজ-সরল ও পরিশীলিত করে।

ইখতিলাফ কেন হয়?

দীন এতো সুসংরক্ষিত ও সুসংহত হওয়া সত্ত্বেও খুবই যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক কিছু কারণে অনিবার্যভাবেই ফুরুয়ী মাসায়েলে ইখতিলাফ রয়ে গেছে, এর বিকল্প বলতে কোনো

---

১ সুরা হিজর, আয়াত নং : ০৯

২ সূরা নাহল, আয়াত নং : ৪৪

অপশন আর থাকেনি। কারণগুলো হল :

এক. বাস্তবজীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন- দুই ব্যক্তির মন-মানসিকতা কখনো এক হয় না। বুঝ-বুদ্ধি আর উপলব্ধির ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে থাকে বিস্তর ফারাক। এজন্যই দেখা যায়—ঘরোয়া কাজে পিতাকে দেওয়া চার সন্তানের মতামত হয় চার রকম, কখনোই এক হয় না।

তদ্রুপ শরিয়তের কোনো মাসআলা যখন সামনে আসে, সাথেসাথেই এক আলিমের দৃষ্টি যায় মাসআলাটির দলিল হিসেবে বর্ণিত হাদীসের দিকে, অন্যজন থেকে যান নিজস্ব চিন্তা-গবেষণার মাঝেই। ফলে তার যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির আলোকে তিনি ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন।

এর চেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক হাদীস থেকে একজন আলেম একটি বিষয় বুঝতে পারেন; কিন্তু অন্য আলিমের চিন্তায় ওই বিষয়টি আসেই না। অথবা— আয়াত বা হাদীসে দ্ব্যার্থবোধক শব্দ থাকায় কোনো আলিম বাহ্যিক কোনো ক্বারীনার (সূত্রের) ভিত্তিতে একটি অর্থকে তারজীহ (প্রাধান্য) দেন, অন্যজন তার বুঝ অনুযায়ী অন্য কোনো সূত্র বা প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে অন্য অর্থকে তারজীহ দেন।

এ অবস্থায় একজনকে অন্যজনের মতামত মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে? (যাবে না! ব্যাস, ইখতিলাফ রয়ে গেল।)

দুই. এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আমল করতে হবে 'সহীহ হাদীসে'র আলোকে, কিন্তু হাদীস সহীহ এবং আমলযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহের ক্ষেত্রে একেবারে শুরু থেকেই আইম্মায়ে কেরামের চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন— কেউ সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য লিকা তথা সাক্ষাতকে প্রয়োজন মনে করেন। কেউ মুরসাল হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করেন, আবার কেউ কেউ তা মনে করেন না ইত্যাদি।

এধরনের নানাবিধ কারণেই সকল মাসআলায় সবাই একমত হওয়াটা অসম্ভব। (তাই অনিবার্যভাবেই ইখতিলাফ থেকে যায়।)

তিন. তেমনিভাবে ইলমী যোগ্যতায় সবাই সমান হন না, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ এলাকা, উস্তাদসহ সবকিছুতেই রয়েছে ভিন্নতা। সুতরাং তারতম্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। বহুবার এমনও হয়েছে যে, একজন আলেমের কাছে একটা হাদীস পৌঁছেছে; অথচ অন্যজন সেই হাদীসের ব্যাপারে একেবারেই জানতেন না, এ অবস্থায় সবাই কীভাবে একমত হবে! সম্ভব? (সম্ভব নয়! তখন ফলস্বরূপ ইখতিলাফ সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক।)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন : অনেক হাদীস এমন আছে, যা আমলযোগ্য না হওয়ার কোনো দলীল কোনো না কোনো আলেমের কাছে অবশ্যই আছে; কিন্তু আমাদের তা জানা নেই..। কারণ, ইলমের রাস্তা খুবই প্রশস্ত। আলেমদের সিনায় রক্ষিত সকল ইলমের ব্যাপারে আমরা অবগত নই।[১] (দলীলটা আমাদের কাছে না থাকার কারণে আমরা হাদীসটি অনুযায়ী আমল চালিয়ে যাব, আবার যার কাছে হাদীসটি আমলের ক্ষেত্রে

[১] রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আলাম, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., পৃষ্ঠা : ৩১

গ্রহণযোগ্য না হবার দলীল আছে তিনি হাদীসটি গ্রহণ করবেন না, ফলে তার আমল হবে ভিন্নরকম। ইখতিলাফ থেকেই যাবে।)

চার. এরচেয়ে বড় বিষয় হলো, একই বিষয়ে যখন পরস্পর বিপরীতমুখী হাদীস পাওয়া যায় এবং সবগুলোই সহীহ হয়, তখন কোনটা মানা হবে আর কোনটা ছাড়া হবে এক্ষেত্রেও সবার উসূল ও তরীকা ভিন্ন ভিন্ন। কেউ এক হাদীসকে মানসুখ বলে অন্য হাদীসকে প্রাধান্য দেন; আবার কেউ গ্রহণ করেন বিপরীত হাদীসটিকে। বরং এমনও হতে পারে যে, হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হওয়ার কোনো দলিল না থাকা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো শক্তিশালী কারণেই একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

এসব যৌক্তিক ও যথার্থ কারণেই অনেক মাসআলায় ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। তবে এসব ইখতিলাফের মৌলিক কারণসমূহ যেহেতু খুবই যৌক্তিক ও সৃষ্টিগত, তাই ইখতিলাফ কখনো অগ্রাহ্য কিংবা উপেক্ষিত ছিল না, বরং এর কল্যাণে যে বিপুল মাসায়েল সামনে এসেছে, তাতে তৈরি হয়েছে ইলমের এক সুবিশাল সম্পদ। এটা কেবল এ উম্মাহরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মহান অবদান।

ইখতিলাফের এ ধারা সাহাবা থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত চলমান। এটি এ কথারও প্রমাণ যে- উম্মাহ সদাজাগ্রত! যতদিন উম্মাহর মাঝে প্রাণবন্ততা আর ও সজীবতা থাকবে ততদিন এই সিলসিলাও ধারাবাহিক চলতে থাকবে; নিত্যনতুন মাসআলা-মাসায়েল দিয়ে এই সুবিশাল ফিকহীসম্পদ দিনদিন সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

সালাফের দৃষ্টিতে ইখতিলাফের গুরুত্ব

সালাফ কখনোই এই মতভিন্নতাকে পরস্পর মতানৈক্য ও শত্রুতার কারণ হিসেবে দেখেননি, বরং দেখেছেন সম্মানের দৃষ্টিতে। এর যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন, গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং একরকম উৎসাহিতও করেছেন।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রাহ. বলতেন, এ কথা আমাকে কখনোই আনন্দিত করে না যে, "সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যদি ইখতিলাফ না হতো!" কারণ, তাদের মাঝে মতভিন্নতা না হলে আজ এতো সহজতা আর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেত না।

হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর রাহ., মদীনা মুনাওয়ারার ফুকাহায়ে সাবআর একজন। তিনি বলতেন, সাহাবিদের পরস্পরের মতভিন্নতার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের প্রতি অসীম রহম করেছেন। তাই সেসব থেকে যে মতের উপরই তুমি আমল করো না কেন অন্তরে তোমার খটকা না থাকা উচিত।[১]

কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইখতিলাফুল উলামা সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ইলমের মূলভিত্তি, সফলতার সিঁড়ি, ও আমলের প্রয়োজন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। খতীব বাগদাদী রহ. বিভিন্ন তাবেয়ী থেকে এমন উক্তি নকল করেছেন।[২]

---

[১] কিতাবুল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১১৬; জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী, ইবনে আব্দুল বার, ২/৯০

[২] কিতাবুল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, ২/৪০-৪১

আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. উসমান আল-বাত্তী রহ.[১] এর কাছে আবেদন করলেন, আমাকে কিছু ফিকহের ইলম শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, ইখতিলাফ শুনো এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো।[২]

এ জন্যই কাউকে অনেক বড় আলেম হিসেবে গণ্য করার জন্য ইখতিলাফুল উলামা সম্পর্কে তার অবগত হওয়াকে সনদ হিসেবে বিবেচনা করা হত। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের রহ. বলতেন,

أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف

ইখতিলাফুল উলামা সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আলেম।[৩]

এ কারণে জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে অনেক আলিমদের প্রশংসা বাণীর ক্ষেত্রে এটাও উল্লেখ থাকে যে, তিনি ইখতিলাফের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। কোনো কোনো আলেমের কামালিয়্যাতের প্রমাণ হিসেবে এটি উল্লেখ করা হয়। ইমাম আহমাদ রহ. (মৃত্যু ২৪১ হি.) ইমাম মুহাম্মদ বিন নসর আল-মারওয়াযী (মৃত্যু ২৯৪ হি.) ইমাম ইবনে জারীর তাবারীসহ (মৃত্যু ৩১০ হি.) অন্যান্য আলেমদের জীবনী অধ্যয়নের দ্বারা এ বিষয়টি বুঝা যায়।

ইখতিলাফের ক্ষেত্রে সাহাবিদের কর্মপন্থা

সাহাবিদের মাঝেও ইখতিলাফ ছিল। প্রতিনিয়ত তারা এই বিষয়ের সম্মুখীন হতেন এবং খুব সুন্দরভাবেই তারা তা কাটিয়ে উঠতেন; কোনো বিভেদ মনোমালিন্যতা সৃষ্টি হত না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও তাদের মাঝে বিভিন্ন ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর ওয়াফাতের পরও তা অব্যাহত ছিল।

যেমন, সকলেরই জানা কথা—সফর অবস্থায় রোজা না রাখার অবকাশ আছে। এমনকি এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, সফরে রোযা রাখাতে কোনো সাওয়াব নেই।[৪] তা সত্ত্বেও কয়েকজন সাহাবী সফরে রোজা রাখতেন। কারণ মনে করতেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ একটা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন। তাই রোজা রাখার দরুন যদি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাঘাত না ঘটে বা পেরেশানির শিকার না হয় তাহলে রোজা রাখতে সমস্যা নেই।

অথচ অন্যান্য সাহাবিদের মতে প্রিয়নবীর কথার মর্যাদা রক্ষার্থে রোজা না রাখা উচিত; তাই তারা সফরে রোযা রাখতেন না। কিন্তু রোযা রাখা না রাখা নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে

---

[১] দুজনই ছিলেন তাবেয়ী।

[২] জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী, ১/৭৮৪ পৃ.

[৩] তাহযীবুল কামাল, ৫/৮০ হাশিয়া

[৪] হাদিসের লফয হলো- لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

দেখুন : সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ১৯৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১১১৫; জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ৭১০, সুনানে দারেমী, হাদিস নং : ১৭৫০; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ২২৫৭

কিছুই বলতেন না। অনেক সাহাবী এটি বর্ণনা করেছেন । যেমন, হযরত জাবের রা., হযরত আনাস রা. ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.- এই তিনজন সাহাবী থেকে এধরনের বর্ননা সহীহ মুসলিমে এসেছে যে- "আমরা যখন রমযানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হতাম তখন আমাদের মাঝে কেউ রোজা রাখতেন আর কেউ রাখতেন না। কিন্তু রোজা রাখা না-রাখা নিয়ে কেউ অপরকে কটাক্ষ বা বিদ্রুপ করত না।"[১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এই বাক্য রয়েছে,

فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ

এই বিষয় নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অন্তরেও কোন কিছু অনুভব হতে দিতেন না।[২]

আরেকটি উদাহরণ দেখুন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়াতুল আহযাব থেকে অবসর হতেই বনু কুরায়যাতে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। ওখানের ইহুদীদেরকে চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এই আদেশ করেছেন। এজন্য খুবই গুরুত্ব দিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

তোমাদের প্রত্যেকেই আসরের নামাজ যেন বনু কুরায়যায় গিয়েই পড়ে।

কিছু সাহাবা ভেবেছেন, রাসুলের উদ্দেশ্য হলো তাড়াতাড়ি করা। তাই আমরা নামাজ পড়ে জলদি রওনা হয়ে গেলে তো কোনো সমস্যা নেই। এ ভেবে পথিমধ্যেই তারা নামাজ পড়ে নিয়েছেন।

অন্যান্য সাহাবীগণ বললেন, তা কিছুতেই সম্ভব নয়, হুজুরের আদেশ ওখানে গিয়েই নামাজ পড়ার। আর তারা এমনটাই করেছেন। এরপর হুজুরের কাছে ব্যাপারটা বলা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারোর উপর কঠোরতা না করে উভয় পদ্ধতিকেই সহীহ মনে করেছেন। কারোর কাজকে মাকসাদের বিপরীত ভাবেননি।[৩]

এছাড়াও আরো অনেক মাসায়েল নিয়ে সাহাবিদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। শুধু হযরত আয়েশা ও অন্যান্য সাহাবীদের মাঝের মতভিন্নতাকে আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃত্যু ৭৯৪ হি.) الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হযরত আয়েশা ও অন্যান্য সাহাবীদের মাঝে এমন অনেক মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েল তিনি এ বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এমন শাখাগত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা সকলেই এক ছিলেন। সকল ইখতিলাফাত শেষ করে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে একটিমাত্র মতকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী সবাই আমল করুক— এই প্রচেষ্টা তাদের কেউই করেননি।

---

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬১৫, ২৬১৭, ২৬১৮,

[২] এই রেওয়ায়েতগুলোর জন্য দেখুন, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১১১৬ -১১১৮, সহীহ বুখারী, হাদিস নং, ১৯৪৭, জামে তিরমিজী, হাদিস নং, ৭১৩, মুসনাদে আহমাদ, ১১০৮৩

[৩] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৯৪৬, ৪১১৯

তাবেয়ীদের পদ্ধতি

তাবেয়ীরা এই অমূল্য সম্পদ মিরাস সূত্রে পেয়েছেন সাহাবিদের থেকেই। তাদের পরস্পরের মাঝেও ইখতিলাফ ছিল। তবে এ কারণে কখনোই তারা একে অপরকে ভালো-মন্দ কিছু বলতেনও না, কেউ কেউকে গোমরাহও মনে করতেন না। আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ. বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত তাবেয়ি ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনসারী রহ. বলেন : "মুফতীগণ সর্বদাই ফতোয়া দিয়ে থাকেন। কেউ এক বিষয়কে হালাল বলেন, অন্যজন বলেন হারাম। কিন্তু যিনি হারাম মনে করেন, কখনই তিনি হালাল গ্রহণকারী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন না যে, হালাল বলার কারণে তিনি ধ্বংস হয়ে গেছেন; হালাল হওয়ার মত গ্রহণকারীও এমন করে ভাবেন না। এমনকি একে অপরকে কটাক্ষও করেন না।"[১]

ইখতিলাফ : আল্লাহর কাছে রাসুলের মর্যাদার প্রমাণ

(ফিকহী মাসায়েলের) ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নীত মর্যাদা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হবার অন্যতম প্রমাণ।

এই কথার ব্যাখ্যা হলো, এসব মতভিন্নতা থকার কল্যাণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুন্নতই ছেড়ে দিতে হয়নি, ছোট-বড় সব সুন্নতের উপর আমল হচ্ছে এবং আমল হতে থাকবে।

স্বয়ং তাবেয়ীরাও এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। তাই প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আউন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ বলতেন,[২] এটা আমি কখনোই কামনা করিনি যে- "আহা! সাহাবিদের মাঝে যদি ইখতিলাফ না হতো!" কারণ, তারা সবাই যদি কোনো আমলের ব্যাপারে একমত হয়ে যেতেন আর এরপর কেউ সে আমল ছেড়ে দিত, তাহলে সে সুন্নত তরককারি হিসেবে সে গণ্য হত। কিন্তু আমলটির ব্যাপারে যদি সাহাবায়ে কেরামের ইখতিলাফ থাকে, আর কেউ যদি একজন সাহাবীর মত গ্রহণ করে, অন্যজন অপর কোনো সাহাবীর মত গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করে, তাহলে উভয়ের আমলই সুন্নাহসম্মত আমল বলে গণ্য হবে।[৩]

ইখতিলাফ রহমত ও প্রশস্ততার কারণ

এজন্য সালাফের এক বিশাল জামাত সকল মতভিন্নতাকে ইখতিলাফ বলাটাই অপছন্দ করতেন। বরং এটাকে তারা আখ্যায়িত করতেন রহমত ওয়াসআত (প্রশস্ততা) নামে। একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী তালহা বিন মুসাররিফ সম্পর্কে লেখা আছে, তার সামনে বিভিন্ন ইখতিলাফের আলোচনা হলে তিনি বলতেন, এটাকে ইখতিলাফ বলবে না, বরং প্রশস্ততা বল।[৪]

---

[১] দেখুন জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী, ২/৯০৩, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১/১৩৯

[২] যিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহুর ভায়ের নাতি

[৩] দেখুন সুনানে দারেমী, মুকাদ্দামা বাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা, ৬৩২ পৃষ্ঠা

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/১১৯

জনৈক ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেছিলেন। তখন ইমাম আহমাদ তাকে বলছিলেন, كتاب الاختلاف নাম না রেখে বইটির নাম রাখো كتاب السعة।[১]

মন তো চায় এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে, যেন অপরিপক্ক ও ইখতিলাফ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে সৃষ্ট সব ধরনের সন্দেহ, সংশয় দূর হয়ে যায়। সেটাকে ভয় ও বিপদ মনে করার পরিবর্তে যেন মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারে। কিন্তু আলোচনা তখন দীর্ঘ হয়ে যাবে। তারপরও গুরুত্বপূর্ণ দুটো কথা শুনে নিন।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ. এর অন্তর্দৃষ্টি

কয়েকজন লোক হযরত উমর বিন আবদুল আযীয রহ.-কে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন লোকদের মাঝে প্রচলিত মতভিন্নতাকে মিটিয়ে হুকুমতের সাহায্যে সকলকে যেকোনো এক মতের উপর ঐক্যবদ্ধ করেন।

তিনি বললেন, ইখতিলাফ না হওয়া তো আমাদের জন্য খুশির সংবাদ নয়! অর্থাৎ, ইখতিলাফের কারণেই দীনের মধ্যে প্রশস্ততা এসেছে।

এরপর তার শাসনাধীন অঞ্চলে এই ফরমান জারি করেন যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ যেন নিজ নিজ এলাকার ফকীহদের মত অনুযায়ী আমল করে।[২]

উম্মতের উপর ইমাম মালিক রহ. এর মহান অবদান

হযরত ইমাম মালিকের ঘটনা তো অনেক প্রসিদ্ধ। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো, তিনি মুআত্তা রচনাকালে খলিফা আবু জাফর মানসুর তাকে বললেন, আমি এই মর্মে এক শাহী ফরমান চালু করতে চাই- লোকজন যেন মুআত্তার রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করে। এর বিপরীত সকল মতামত যেন ছেড়ে দেয়। অন্যথায় তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

ইমাম মালিক রহ. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! কিছুতেই এমন করবেন না। রাসূলের ওয়াফাতের পর সাহাবাগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে গেছেন এবং নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী ইলমের প্রচার-প্রসার করেছেন; এ কারণেই বিভিন্ন ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোই সঠিক, সবাই হকের উপর আছেন। সুতরাং সবাইকে আপন আপন অবস্থায়ই থাকতে দিন। এখান থেকে সরানোর চেষ্টা করলে খুবই জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার আশংকা বোধ করি! অন্য বর্ণনায় আছে, না জানি এমন অপচেষ্টা কারণে মানুষ কুফর গ্রহণ করে বসে।[৩]

এটা ইমাম মালিক রহ.-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের ইখলাস, অন্তর্দৃষ্টি এবং উম্মাহর উপর এক মহান অবদান ছিল যে, তিনি সকল মতভেদ মিটানোর নাম করে নিজের মতামতকে সকলের

---

[১] আল মুসাওয়াদাহ, আলে ইবনে তাইমিয়া, ৪১০; মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৫/৩৫৪, এতে কিতাবুস সাআহ এর পরিবর্তে কিতাবুস সুন্নাহ লিখা আছে।

[২] সুনানে দারেমী: ৬৩১

[৩] তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৭/৫৭৩-৫৭৪, অন্যান্য লেখকগন যৎসামান্য পরিবর্তন করে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উল্লেখিত বিষয়টিই সবগুলোর সারাংশ।

উপর চাপিয়ে দেননি। কারণ ভালোভাবে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন, এক মতের উপর উম্মতকে একত্রিত করতে গেলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

এমন ছিল আমাদের সালাফের কর্মপন্থা। কিন্তু বর্তমানে সালাফের নাম নিয়ে, নিজেদেরকে সালাফের দিকে সম্পৃক্ত করে আমাদের কিছু ভাই ইখতিলাফকে আপদ আখ্যা দিয়ে শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলের বিতর্কিত ইস্যু উস্কে দিয়ে জনসাধারণের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন; ফলে উম্মাহর মাঝে নৈরাজ্য ও বিচ্ছিন্নতার পালে হাওয়া দেওয়ার মতো গর্হিত কাজ যেভাবে নবরূপে আভির্ভাব হচ্ছে তা কারো কাছেই অজানা নয়।

সালাফের দৃষ্টিতে যঈফ হাদীসের অবস্থান

যঈফ হাদীস নিয়ে নানারকম কথাবার্তা বলে তারা। কখনো যঈফ হাদীসকে মওজু হাদীসের মতো অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, অথচ তারা জানে না বা জানতে চায়ও না যে, সালাফের মাঝে যঈফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা আছে। এবং কেবল ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীসের মধ্যেই নয়, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও তারা যঈফ হাদীস থেকে ইসতিদলাল করেছেন। কোনো এক-দুজন ফকীহ নন, বরং সকল ফুকাহায়ে কেরামই যঈফ হাদীসের ইস্তেদলাল গ্রহণ করেছেন। ইমাম তাজুদ্দিন আবুল হাসান আলী আল-আরদাবিলী (মৃ. ৭৪৬হি.) আল-মি'য়ার (المعيار) নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির প্রথমাংশে[১] তিনি ওসব যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেসবকে ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের বিভিন্ন মাসায়েলে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হানাফী শাফেয়ী মালেকী ও হাম্বালীসহ চার মাযহাবের ফকিহগণ শামিল আছেন এই তালিকায়। এমনকি ইমাম ইবনে হাযম জাহেরী রহ.ও কিছু আহকামের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস থেকে ইসতিদলাল করেছেন।[২]

إذا صح الحديث فهو مذهبي

إذا صح الحديث فهو مذهبي ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ উক্তি।[৩] অর্থ হল- সহীহ হাদীস যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটাই হবে আমার মাযহাব।

এই উক্তি সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে অনেক রথী-মহারথীদের পা ফসকে গেছে। অনেকেই বিভ্রান্তিকর ধোঁয়াশায় পতিত হয়েছেন। এমনকি ইমাম আবু মুহাম্মদ

---

[১] এই অংশটি ১৪২৬ হিজরীতে দামেশক থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

[২] আল-মুহাল্লাতে কুনূতের আলোচনা দেখুন ৪/১৪৮

[৩] হুবহু এই উক্তিটি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকেও বর্ণিত আছে। ইবনুল হুমামের উসতাদ ইবনুশ শিহনাহ রহ., মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আব্দিল বার রহ, খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন ইবনে আবিদীন শামী রহ.সহ আরো অনেক আইম্মায়ে কেরাম এই উক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।
আল্লামা ইরাকী রহ. আল মুসতাখরাজ আলাল মুসতাদরাক গ্রন্থে, শামী রহ. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে লিখেছেন :

صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي

ইমাম শারানী রহ. মাযহাব চতুষ্টয়ের চারো ইমাম থেকে এই বক্তব্যটি বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : শরহু উকূদি রাসমিল মুফতী (তাহকীক : মুফতী আবু লুবাবাহ), ইবনে আবেদীন শামী, পৃষ্ঠা : ৯৭; আসারুল হাদিসিশ শরীফ (ষষ্ঠ সংস্করণ), শাইখ আওয়ামা, পৃষ্ঠা : ৫৮ (ম.)